গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ওয়েবেল বন্ধের প্রতিবাদে শ্রমিকসভা

সিপিএম ফ্রন্ট সরকার পরিচালিত ওয়েবেলের পাঁচটি ইউনিট ৩১ আগস্ট থেকে বন্ধ করে দিয়ে ৪৫০ জন কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করার প্রতিবাদে ৩০ আগস্ট সল্টলেকের ওয়েবেল ভবনের সামনে এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-এল এস'এর রাজ্য সহসম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড দীপক দেব, কমরেড শ্যামল দত্ত ও কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা কমরেড অরুণ চৌধুরী। এর আগে গত ২৭ আগস্ট তারাতলায় অবস্থিত ওয়েবেল ভিডিও ডিভাইসেস লিমিটেড-এর গেটে ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে এক শ্রমিকসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবেলের ৪৫০ জন শ্রমিকের অধিকাংশই সিটু ইউনিয়নভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সিটু এর বিরুদ্ধে নীরব। শিল্পটিকে রুগ্ন দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মতই সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের দেওয়া আগাম অবসরের প্রস্তাব মেনে নিয়ে এই শ্রমিকদের চাকরি ছাড়তে বাধ্য করছে। যে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার সোচ্চারে বলছে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে নাকি জোয়ার আসবে, তারাই পশ্চিমবাংলার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ওয়েবেলের ৪৫০ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গকে বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিল ৩১ আগস্ট।

২৭ আগস্ট ঐ কারখানার এবং এলাকার শ্রমিক-কর্মচারীদের বিশাল সমাবেশে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহসম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন — কংগ্রেস বা বিজেপি যারাই কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করুক না কেন সকলেই পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি অনুসরণ করে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম পরিচালিত সরকারও এই একই নীতি নিয়ে চলেছে। সর্বদিক থেকে আক্রান্ত আজ শ্রমিক কর্মচারীরা। শুধু ওয়েবেল নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত অন্যান্য সংস্থার শ্রমিকরাও আজ আক্রান্ত। তিনি ওয়েবেলসহ সমস্ত বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড সমর সিন্‌হা, কমরেড বিমল জানা।

রাইটার্সে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভে লাঠিচার্জ

তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ রীতি প্রত্যাহার, বিদ্যুৎ আইনের ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে অবিলম্বে বর্ধিত মাশুল ও বকেয়ার বোঝা রোধ, জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের জন্য কেন্দ্রের কাছে রাজ্য সরকারের লিখিত আর্জি পেশ, কৃষিতে বিনাপয়সায় বিদ্যুৎ এবং গরিব, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্পে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুতের দাবিতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েসনের নেতৃত্বে কয়েক হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক ২৬ আগস্ট বেলা ২টায় ইডেন গার্ডেনের সামনে থেকে নবমহাকরণের দিকে যেতে থাকলে পুলিশ মাঝপথে মিছিলের গতিরোধ করে। তখন মিছিলকারীরা স্ট্র্যান্ড রোড অবরোধ করে। এই অবরোধকালীন সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন যে, প্রশাসনকে আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ নবমহাকরণের সামনে সভা করার অনুমতি দেয়নি। তাই এর প্রতিবাদে ৫০০-র অধিক বিদ্যুৎগ্রাহক বিধান চ্যাটার্জী ও অন্যান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে মহাকরণে প্রতিবাদ জানাতে গেলে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। ফলে ১০ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক আহত হন এবং সংগঠনের দুজন নেতাসহ ২১ জন বিদ্যুৎগ্রাহককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

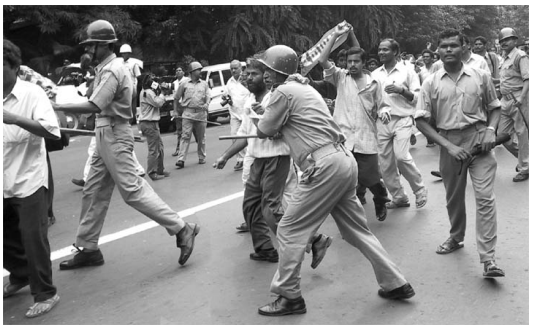

অ্যাবেকার সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল স্ট্র্যান্ড রোডে সভা চলাকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেন এবং গ্রাহকদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। পুলিশ কর্তৃক লাঠিচার্জের হুমকি সত্ত্বেও রাস্তায় সভার কাজ চলতে থাকে এবং বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এই সভায় অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস রাইটার্সে বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা করেন এবং তিনি রাজ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, লাঠিচার্জ করে, অত্যাচার করে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। তিনি জানান, ৯ সেপ্টেম্বর জেলায় জেলায় আইন অমান্য এবং কলকাতায় সি ই এস সি'র সব ক্যাশ অফিসেই বিল বয়কট করে প্রতিবাদ জানানো হবে। এতেও কাজ না হলে তীব্রতর গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে আহ্বান জানান।

বুদ্ধদেববাবুর দায়বদ্ধতা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মুখোশের আর একটি পরদা খুলে পড়ল। বলা ভাল নিজেই ছিঁড়ে ফেললেন। তিনি এবং তাঁর দল যে পুঁজিপতিদের সেবায় কতখানি নিবেদিত প্রাণ তা প্রমাণ করতে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কোন রাখ্-ঢাকের বালাই আর নেই। গত ২১ আগস্ট মুম্বাইতে আনন্দবাজার পত্রিকা আয়োজিত 'ডুয়িং বিজনেস ইন বেঙ্গল' শীর্ষক আলোচনা সভায় বুদ্ধবাবু একেবারে নতজানু হয়ে আবেদন করলেন — 'শিল্পমহল যেন তাঁর উপরেই আস্থা রাখেন।' (আনন্দবাজার ২৩-৮-০৪)। ঐ সভায় বুদ্ধবাবুদের প্রকৃত দায়বদ্ধতা শ্রমিক না মালিক কাদের প্রতি তা স্পষ্ট করে জানতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের পুঁজিপতি শিরোমণি রতন টাটা, মুকেশ আম্বানি, কেশব মাহিন্দ্র, আদি গোদরেজ, দীপক পারেখ, হর্ষ গোয়েঙ্কা প্রমুখ। শিল্পপতিদের এমন 'নক্ষত্র সমাবেশে কথা বলার সুযোগ বুদ্ধবাবু কদাচিৎ পেয়েছেন।' তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার তিনি আপ্রাণ চেষ্টাও করেছেন।

সিপিআই(এম) দলের পলিটব্যুরোর সদস্য এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে দিয়েছেন তাঁদের দলের বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ এবং শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে কিছু স্লোগানে বিভ্রান্ত হলে পুঁজিপতিরা ভুল করবেন। তাঁদের প্রকৃত ভূমিকাটা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন — 'ট্রেড ইউনিয়নকে এখন উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে, কী করে পণ্যের গুণমান উন্নত করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন এখনো ষাট-সত্তরের ভুল পথে হাঁটতে চাইছে, আন্দোলনের নামে শৃঙ্খলা ভাঙতে চাইছে, এসব চলবে না। ঘেরাও, জঙ্গি আক্রমণ (আন্দোলনকে উনি আক্রমণ বলছেন) বন্ধ করতে হবে, না হলে আমি পুলিশ পাঠাব। বাংলা বন্‌ধ? ওতে কোন লাভ হয় না, উল্টে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়। ''বিদেশি বিনিয়োগ?'' বুদ্ধদেববাবুর সাফ্ কথা 'পশ্চিমবঙ্গে আমি এফ ডি আই চাই।' 'আমি পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ চাই। আমি তো এর আগের মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলাম, আপনারা যদি চিনে বিনিয়োগ করতে পারেন, তা হলে এখানে পারবেন না কেন? এবং আমি বলে যাব।' বার্ণপুরে সরকারি ইস্পাত কারখানা বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সিটু যতই স্লোগান দিক্, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য একেবারে চাঁছাছোলা — 'কেন্দ্রীয় সরকার ইস্কো হাতে নিয়ে দু'এক বছর চালাতে পারে। কিন্তু বেসরকারীকরণ ছাড়া এই সংস্থার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।' তাহলে ইস্কোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে কিসে? সভায় উপস্থিত সজ্জন জিন্দালকে উদ্দেশ্য করে তিনি সরাসরি আবেদন করেন — 'আপনারা ইস্কো নিয়ে নিন, না হলে ইস্কো বাঁচবে না।' সংবাদে প্রকাশ, 'পশ্চিমবঙ্গের

দুয়ের পাতায় দেখুন

এথেন্সের পার্থেননে পাওয়েল বিরোধী ব্যানার। ২৯ আগস্ট অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলের যোগদানের সংবাদ প্রকাশ পেতেই গ্রীসের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, পাওয়েল সফর বাতিলে বাধ্য হন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পরিচারিকা সমিতির জেলা কার্যালয় উদ্বোধন

গত ১৮ আগস্ট জয়নগরে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়েছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিচারিকা বিপুল উৎসাহে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর জেলা সভাপতি কমরেড রেণুপদ হালদার। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা। প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি

ভাষণরত কমরেড শংকর সাহা। মঞ্চে উপবিষ্ট কমরেড ইয়াকুব পৈলান ও রেণুপদ হালদার

আই-এর জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বসু। এছাড়া পরিচারিকা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী পার্বতী পাল এবং রাধা মিত্র, শান্তিরাম পাল, শান্তি প্রামাণিক, সোনামণি হালদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। কমরেড শঙ্কর সাহা জেলা কার্যালয়ের দ্বারোদঘাটন করেন তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে পরিচারিকাদের জীবনের নানা সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এবং অসংগঠিত শ্রমজীবীদের শ্রমিকের মর্যাদা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ধক্যভাতা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সন্তানের শিক্ষা ইত্যাদি দাবি নিয়ে সুসংগঠিত গণআন্দোলনের সঠিক রাস্তা তিনি পরিচারিকাদের সামনে তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি কমরেড ইয়াকুব পৈলান বলেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের উপর মালিকশ্রেণী যে শোষণ জুলুম অত্যাচার চালাচ্ছে পরিচারিকারা তার শিকার হচ্ছেন, তার সাথে অসংগঠিত মহিলা হিসাবে অবমাননা, লাঞ্ছনা ও শারীরিক নিগ্রহেরও তাঁরা শিকার হচ্ছেন। এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র রাস্তা। এরপর পরিচারিকাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম শ্রমিক নেতা কমরেড শিশির মিস্ত্রী। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির সম্পাদিকা পুষ্প পাল পরিচারিকাদের স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা ও অন্যান্য সমস্যার বিরুদ্ধে পরিচারিকা সমিতির আন্দোলন ও সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কমরেড রেণুপদ হালদার সমাপ্তি ভাষণে বলেন, পরিচারিকাদের মাসিক টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা মোকাবিলা করার জন্য সমিতির সদস্যাদের শৃঙ্খলার সাথে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই তারা সার্বিক সফলতা অর্জন করতে পারবেন।

উত্তর ২৪ পরগণা

বারাকপুর মহকুমায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা

গত ২২ আগস্ট শ্যামনগর ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার হলে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে বারাকপুর মহকুমার একটি সাংস্কৃতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। শ্যামনগর অগ্নিবীণা সংসদ, তরুণ মেমোরিয়াল স্কুল ফর দি সাইটলেস, ইমন মাইম সেন্টার, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং দলের শুভানুধ্যায়ী সাংস্কৃতিক কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। একক সঙ্গীত, সমবেত সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য, গল্পপাঠ, স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং মূকাভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এই কর্মশালা। দৃষ্টিহীন ছাত্রীদের নৃত্য এবং ইমন মাইম সেন্টারের মূকাভিনয় মনোগ্রাহী হয়। কর্মশালার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কমরেড অমল সেন কর্মশালার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনে উন্নত সংস্কৃতি চর্চার জন্য সঙ্গীতগোষ্ঠী, নাট্যগোষ্ঠী, আবৃত্তিগোষ্ঠী এবং লেখক গোষ্ঠী গড়ে তোলাই হল এই কর্মশালার মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্মশালার মুখ্য পরিচালক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায়। তিনি উপস্থিত ৬০ জন প্রতিনিধিকে সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রয়োজনে, গণআন্দোলনের প্রয়োজনে এবং উন্নত সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গান, আবৃত্তি, নাটক, শিল্পচর্চা এবং প্রসারের জন্য উদ্যোগী হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে চারণকবির গান, তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, ডি এল রায়, নজরুলের সঙ্গীত, কবিতা যেভাবে বিপুল প্রেরণা যুগিয়েছিল সেই শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আমাদের এগোতে হবে। উৎপীড়িত শোষিত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই যথার্থ অর্থে মহৎ সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে। কর্মশালা থেকে একটি পরিচালক কমিটি গঠিত হয়।

মেদিনীপুর

ঘাটালে বন্যা ঃ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হল প্রশাসন

পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় যখন খরা চলছে তখন ঘাটাল মহকুমার ঘাটাল ও দাসপুর থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়েকদিনের বৃষ্টিপাতে বন্যায় লক্ষাধিক মানুষ জলবন্দী, ৪০০-র বেশি মাটির বাড়ি ভেঙে গেছে। আরও ৩০০ মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। ৩ জন মানুষ মারা গেছেন। সরকারি কোন রিলিফের ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট চলছে। ইতিমধ্যে আন্ত্রিক ছড়িয়ে পড়ছে। চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারিভাবে নেওয়া হয়নি।

প্রতি বছর ঘাটাল মহকুমায় বন্যা হয়। স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধে ১৯৮২ সালে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন সেচমন্ত্রী প্রভাস রায় ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এরপর ঐ মাস্টারপ্ল্যান আঁস্তাকুড়ে চলে গেছে। প্রতি বছর ঘাটালবাসী বন্যায় ডুবে সর্বস্বান্ত হয়, রাজ্য সরকার কিছু চিড়ে গুড় পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করে। ক্ষুব্ধ ঘাটালবাসী ঘাটাল মহকুমা খরা বন্যা প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলে কয়েক বছর ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের দাবিতে। গত ১২ আগস্ট ঘাটাল শহরের শহীদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে গণঅবস্থান করার পর সহস্রাধিক দুর্গত মানুষকে নিয়ে প্রতিরোধ কমিটি ২৪ আগস্ট ক্ষুদিরাম মূর্তির সামনে ঘাটাল-পাঁশকুড়া বাসরাস্তা অবরোধ করে দু'ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে অবরোধ ভাঙতে এলে প্রবল গণবিক্ষোভে পিছু হঠেন, শেষে কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন ১০ দিনের মধ্যে জেলাসভাধিপতি, জেলাশাসক, ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কমিটির নেতৃবৃন্দের বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেবেন। ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিশ্রুতির পর কমিটির নেতৃবৃন্দ অবরোধ তুলে নেন। এই অবরোধে নেতৃত্ব দেন কমিটির সভাপতি সতীশচন্দ্র পাল, যুগ্ম সম্পাদক মধুসূদন মান্না ও ডাঃ বিকাশ হাজরা। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী পুলিনবিহারী সামন্ত, কার্তিক চন্দ্র পাড়ই, প্রাক্তন শিক্ষক নীলরতন মণ্ডল, মেদিনীপুর জেলা বন্যা ভাঙন খরা প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন প্রধানও অবরোধে অংশ নেন। কমিটির সম্পাদক মধুসূদন মান্না বলেন — রাজ্য সরকার যদি দ্রুত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকরী করার ব্যবস্থা না নেয় তাহলে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে মহকুমা বন্ধ করা হবে।

কলকাতা

রিক্সাচালকদের ক্ষুদিরাম স্মরণ

১১ আগস্ট পশ্চিম বেহালায় রিক্সাচালক ভাইয়েরা যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে শহীদ ক্ষুদিরাম দিবস পালন করেন। পল্লীশ্রী, পর্ণশ্রী, ছাতাপার্ক, পর্ণশ্রী-সূর্যসংঘ, ম্যান্টন, আর্য বিদ্যামন্দির, কিশোরভারতী প্রভৃতি ৮টি স্ট্যান্ডে শহীদ দিবস পালিত হয়। প্রতিটি স্ট্যান্ডে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আবেগের সাথে রিক্সা-চালকদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা বলেন, রিক্সাচালকরা যেভাবে গভীর শ্রদ্ধায় শহীদ ক্ষুদিরাম দিবস পালন করছেন, তাতে তাঁরা অভিভূত। বিভিন্ন স্ট্যান্ডে মাল্যদান করেন কমরেডস্ সঞ্জয় জানা, অর্জুন ঘোষ, হরিশচন্দ্র অধিকারী, তপন দাস প্রমুখ ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে একদিনের একটি আলোচনা সভা গত ২২ আগস্ট পশ্চিম বেহালায় ব্যাপক উৎসাহের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রিক্সাচালক, ট্যাক্সিচালক ও পরিচারিকা মিলিয়ে ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনার বিষয়গুলি ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন রাখেন। আলোচনা করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড দীপক দেব, কলকাতা জেলার অসংগঠিত শ্রমিকদের বিশিষ্ট নেতা কমরেড সান্টু গুপ্ত। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন দক্ষিণ শহরতলি রিক্সা ও ভ্যানচালক ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড বিজন হাজরা। আলোচনা সভা সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত হয়। শ্রমিকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ অর্জুন ঘোষ, নিরঞ্জন পাত্র, শিবু দাস, হরিশ অধিকারী প্রমুখ। আলোচনা সভার শেষে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর পশ্চিম বেহালা কমিটির সম্পাদক কমরেড তপন চক্রবর্তী।

বুদ্ধদেববাবুর দায়বদ্ধতা

একের পাতার পর

বামপন্থী(!) মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই আবেদন শুনে জিন্দাল চমৎকৃত হয়েছেন।' হবেনই তো। কারণ সরকারি কারখানা (জনসাধারণের), তাও আবার রাজ্য সরকারের নয় কেন্দ্রের, তিনি ধনকুবেরদের 'নিয়ে নেওয়ার' আবেদন করছেন। চমৎকৃত হওয়ারই তো কথা। আবেদন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তারপরেই তিনি জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ান শিগ্‌গিরই কলকাতায় আসছেন, তিনি পাশোয়ানকে যা বলার বলবেন।' অর্থাৎ জিন্দাল সাহেব যাতে ইস্কোটা পান তার জন্য কেন্দ্রীয় 'বন্ধু সরকারের' ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে তদ্বিরের গুরুদায়িত্বও তিনি নিজের কাঁধেই স্বেচ্ছায় নিচ্ছেন। দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের লাভের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য অর্থনৈতিক হিসাব দিতে উল্লেখ করেছেন এ রাজ্যের গরিব শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারদের কথা। সস্তায় শ্রমশক্তি এখানে প্রচুর। তাঁর ভাষায়, 'এ রাজ্যে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ অঢেল।' এর পরেই তাঁর মুখে শোনা গেল একটি চমকপ্রদ উক্তি — 'আমরা তো বিংশ শতাব্দীর পড়ে থাকা মানুষ, দায়িত্ব তো নেবে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা।'

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের প্রতি সিপিআই(এম) মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান — এস দায়িত্ব নাও। সস্তায় শ্রম ঢেলে দাও পুঁজিপতিদের পায়ে। উৎপাদন বাড়াও, পণ্যের গুণমান বাড়াও, কিন্তু খবরদার তোমাদের জীবনের গুণমান বাড়ানোর জন্য কোন দাবির কথা উচ্চারণ কোরো না। শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতি নির্দেশ — দাবিদাওয়া চলবে না, আন্দোলন চলবে না, খাটতে শেখাও, ৮ ঘণ্টার জায়গায় ১০ ঘণ্টা ১২ ঘণ্টা, মালিকরা যা বলবে তা মেনে নীরবে ঘাড় গুঁজে কাজ করাও। উৎপাদন বাড়ানোটা অর্থাৎ মালিকের লাভ বাড়ানোটাই ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব। বন্ধ ডেকে পশ্চিমবঙ্গকে কলঙ্কিত করতে আর দেব না। মালিক ছাঁটাই করুক, ক্লোজার-লকআউট করুক, চুপ্ করে ঘরে চলে যাও। অনাহারে মর, আত্মহত্যা কর, ক্ষুধার জ্বালায় কোলের শিশু বিক্রি কর, কিন্তু খবরদার জঙ্গি আন্দোলনের পথে পা দিলেই পা-হাত-মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব, পুলিশ পাঠাব।

বিশিষ্ট পুঁজিপতি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব গভর্ণর 'বিমল জালান সভার শুরুতেই বলেছিলেন, একদিকে অসামান্য সততা এবং অন্যদিকে বাস্তব থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেওয়ার ক্ষমতা, এই দুই কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এখনকার ভারতীয় রাজনীতিতে একটি রোল মডেল হয়ে উঠেছেন। সুতরাং তাঁর দায়িত্ব অনেক।' বুদ্ধদেববাবু বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য তাঁদের দলের ভেতরকার সংবাদ ঐ পুঁজিপতিদের সভায় পেশ করেছেন — 'দলের মধ্যে আমরা এবিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কোনও অবস্থায় অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ বরদাস্ত করব না। ঘেরাও হলে বা অন্য কোন জঙ্গি আচরণ দেখা গেলে পুলিশ পাঠাব। পাঠিয়েছিও। বাটা কোম্পানিতে পাঠিয়েছি, পেপ্‌সি কোম্পানিতে পাঠিয়েছি।' অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায় না বললেও বক্তব্যের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সব কথার মূল কথা হিসাবে যে কথাটি সভায় মুখ্যমন্ত্রী পুঁজিপতি মহলের কাছে রেখেছেন তা হচ্ছে, এত করেও বিশ্বাস করবেন না আমরা আপনাদেরই সেবায় দিবানিশি নিয়োজিত?

কংগ্রেস সিপিএম সমন্বয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থেই

সম্প্রতি কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম 'সমন্বয় ও সংগ্রামের' লাইন অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, হঠাৎ করে সিপিএম এই স্লোগান তুলল কেন? একদা সমন্বয় কমিটিতে আসার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও হঠাৎ সিপিএম সমন্বয়ের জন্য এত উদ্‌গ্রীব কেন? সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন, ''সমন্বয়ের লক্ষ্য কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের স্থায়িত্ব যাতে বিপন্ন না হয়; সংগ্রামের লক্ষ্য, কেন্দ্রীয় সরকার কোন জনবিরোধী নীতি নিলে তা প্রত্যাহারে বাধ্য করা, সেই নীতির অভিমুখ বদলে দেওয়া'' (গণশক্তি ৬-৮-০৪)। সমন্বয় ও সংগ্রামের এটাই যদি অনিলবাবুদের লক্ষ্য হয় তাহলে সরকার গঠনের সময় থেকে বিগত আড়াই মাস ধরে তাদের বিভিন্ন বক্তব্য আরও কিছু প্রশ্ন তুলে দেয়।

প্রশ্ন হল, কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের স্থায়িত্বই যদি সিপিএম নেতারা চান এবং ইউপিএ সরকার জনমুখী নীতি নিক এটাই যদি তাঁদের কাম্য হয়, তাহলে যেমন করে তাঁরা সমন্বয় কমিটিতে ঢুকলেন এবং সংসদ পরিচালনার জন্য স্পীকার হিসাবে দলীয় সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জীকে পাঠালেন, তেমনিভাবে সরকারে অংশ নিলে তা কি আরও বেশি শক্তিশালী হত না? সংবাদে প্রকাশ, সিপিএম ও তার সহযোগী বাম দলগুলিকে কংগ্রেস ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়াও ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীত্ব ছাড়তেও রাজি ছিল। সিপিএম নেতারা যদি মনে করেন অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি একটি জনমুখী কর্মসূচি তাহলে সরকারে যোগ দিয়ে সেই কর্মসূচি রূপায়ণের যে সুযোগ ছিল সেটা তাঁরা গ্রহণ করলেন না কেন? যথাসম্ভব সরকারকে জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করা থেকে আটকাতে এবং জনস্বার্থে কর্মসূচি পরিচালনা করতে সরকারে যোগ দিলেই অনেক ভালভাবে কার্যকরী করা যেত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেছেন, কংগ্রেস একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী ও বৃহৎ ভূস্বামীদের দল, সে কি তার শ্রেণীচরিত্র পাল্টেছে? অর্থাৎ তাঁরা বলতে চাইলেন কংগ্রেস পুঁজিপতিশ্রেণীর দল হিসাবে যেহেতু তার শ্রেণীচরিত্র পাল্টায় নি, অতএব সে জনবিরোধী নীতি নিতে বাধ্য। এটা জানা থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁরা এই সরকারকে সমর্থন করলেন তখন তাদের তো জনস্বার্থে সরকারে যাওয়া আরও বেশি প্রয়োজন ছিল। কারণ সেক্ষেত্রে সরকারে গিয়ে মন্ত্রীত্বে বসে জনস্বার্থে কর্মসূচি নিলে কংগ্রেস যদি বাধা দিত তাহলে কংগ্রেসের চরিত্র জনগণের কাছে আরও বেশি উদ্‌ঘাটিত হত, বামপন্থী লাইন সুস্পষ্টভাবে জনসাধারণের কাছে আসত এবং বামপন্থার শক্তি ও প্রভাব বাড়ত। সরকারে অংশ নিয়ে জনমুখী কর্মসূচি রূপায়ণের চেষ্টা এবং বাইরে থেকে তার পক্ষে আন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করতে পারলে ইউপিএ সরকারকে দিয়ে কিছু জনমুখী কাজ করিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ত। সেটা তাঁরা না করে কী করলেন? বললেন যে, সরকারে গেলে বিরোধিতা করা সম্ভব হত না। কি অদ্ভুত যুক্তি! সরকারে গেলে যদি বিরোধিতা না করা যায়, সমর্থন করে বিরোধিতা করা যায় কী করে? এর উত্তর একমাত্র তাদের মতো মার্ক্সবাদীরাই দিতে পারেন।

তাঁদের দ্বিচারিতার এখানেই শেষ নয়, পরবর্তী অধ্যায় শুরু সিএমপি (অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি) নিয়ে। সিএমপি রচনার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি এবং কংগ্রেসের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা জয়রাম রমেশ। ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে সিএমপি তৈরি করে তাঁরা সরকারকে রূপায়ণের জন্য দিলেন, কিন্তু নিজেরা স্বাক্ষর করলেন না। কেন করলেন না? তাঁরা কি ভেবেছিলেন সিএমপিতে যাই থাকুক কংগ্রেস যা করার তাই করে যাবে? আর সেই জনবিরোধী কাজের দায় যাতে নিজেদের উপর না চাপে সেজন্যই কি সরকারের বাইরে থাকা এবং সিএমপিতে স্বাক্ষর না করা?

অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম বলেছেন, বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (এফ ডি আই) যে সীমা বাড়ানো হয়েছে তা সিএমপি মেনেই করা হয়েছে। যদি চিদাম্বরমের এ-কথা সত্য হয় তাহলে এই সিএমপিতে সিপিএমের সমর্থন ছিল এবং সিপিএমের সমর্থনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ নিয়ে সিপিএমের তো নীতিগত কোন বিরোধ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য মাঝে মাঝে বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, তাদের নানা সুবিধা দেওয়ার কথা বলছে, এমনকী তাদের কোন প্রতিনিধি এলে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাহলে এফডিআই নিয়ে তারা 'মানছি না, মানব না' স্লোগান কাকে শোনাচ্ছেন? তাঁদের দলের কর্মী সমর্থক ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নয় কি?

একথা সকলেই জানেন, সিপিএম সরকারে না গেলেও তারাই এই সরকারের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সিপিএমের সমর্থনের উপরেই এই সরকার দাঁড়িয়ে আছে। ফলে এই সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের দায় সিপিএম এড়াতে পারছে না। জনসাধারণের মধ্যে এবং দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে এ নিয়ে নানা প্রশ্নও উঠছে। এই পরিস্থিতিতে সিপিএম কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার যুক্তি তুলে এখন সমন্বয় কমিটিতে যেতে চাইছে। এই সরকার যে নীতিই গ্রহণ করুক, যতই জনবিরোধী শাসন চালাক, তাকে পাঁচ বছর টিকিয়ে রাখাই সিপিএমের সিদ্ধান্ত। এই অবস্থায় লোকঠকাতে এবং কর্মী-সমর্থকদের বিভ্রান্ত করতে সিপিএম মাঝে মাঝে যত গরম গরম কথাই বলুক, কংগ্রেসও বুঝে গেছে একেবারে তেমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে সিপিএম কোন অবস্থাতেই সমর্থন তুলে নিয়ে তাদেরকে বেকায়দায় ফেলবে না। ফলে কংগ্রেস বুঝেশুনেই বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার সবই নিচ্ছে। জনসাধারণও লক্ষ করছেন এ সরকার পুরোপুরি বিজেপির পথেই চলছে। বাস্তবে বিজেপি যে আর্থিক নীতি নিয়ে চলছিল সেটা পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে নেওয়া কংগ্রেসের মনমোহন সিংয়েরই আর্থিক নীতি। এমনকি মাঝখানে সিপিএমের সমর্থনে কেন্দ্রে দেবেগৌড়া বা গুজরালের নেতৃত্বে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার চলেছিল, তারাও একই নীতি নিয়ে চলছিল। শুধু পার্থক্য হল, বিজেপি যেখানে রাখঢাক না রেখে খোলাখুলি এই আর্থিক নীতি নিয়ে চলতে গিয়ে দ্রুত নগ্ন হয়ে পড়ছিল এবং মানুষের মধ্যে বিজেপি'র বিরুদ্ধে ক্ষোভ তীব্র আকার নিচ্ছিল, কংগ্রেস সেখানে সিপিএমের পরামর্শ অনুযায়ী শঠতা এবং ধূর্ততার সাথে জনবিরোধী কাজের উপর মানবিক লেবেল লাগিয়ে এমনভাবে করছে যে জনবিরোধী চরিত্র সহজে ধরা না পড়ে। সেই অর্থে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের প্রতারণা করার ক্ষমতা অনেক বেশি। তাহলে এহেন কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সমন্বয় কার স্বার্থে?

কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সমন্বয়ে খুশি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণী। খুশি হবে নাই বা কেন? বিজেপি আমলের জনবিরোধী সব নীতিগুলিই তো চলছে। নাইবা থাকুক বিলগ্নীকরণ দপ্তর, অন্য নামে বিলগ্নীকরণ তো চলছে, বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বেড়েছে, পিএফের সুদের হার কমেছে, গ্রামোন্নয়নে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে, পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস-কেরোসিনের দাম বেড়েছে। জ্যোতিষ বিদ্যার মতো অন্ধবিশ্বাস-নির্ভর অবৈজ্ঞানিক চিন্তার বিষয়কে সিলেবাসে আনা হচ্ছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে যেমন যেমন প্রয়োজন, শাসনধারা ঠিক তেমন চলছে। তাহলে তারা খুশি হবে না কেন? বাইরে থেকে সমর্থন দিয়েই হোক আর প্রত্যক্ষভাবেই হোক, সিপিএম এই সরকারের সাথে থাকুক — এটা পুঁজিপতিশ্রেণীই চায়। তারা চায় তাদেরই স্বার্থে কেন্দ্রে একটা স্থায়ী সরকার হোক এবং তাতে সিপিএম থাকুক। কারণ, তাহলে জনগণকে বিভ্রান্ত ও আদর্শগতভাবে নিরস্ত্র করে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে জনবিরোধী পদক্ষেপগুলি নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। ফলে কংগ্রেস-সিপিএম সমন্বয় সেই অর্থে বুর্জোয়া সরকারের স্থায়িত্বের পথে নিঃসন্দেহে একধাপ অগ্রগতি।

কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সমন্বয় বহু বামপন্থী মানুষকে আঘাত করেছে। যাঁরা গ্রামীণ জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, কারখানায়-কারখানায় মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন, '৭২-৭৭ সালের সন্ত্রাস ও ১১০০ বামপন্থী কর্মীর নির্বিচার হত্যা যাঁরা মেনে নিতে পারেননি, '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে কংগ্রেস সরকারের পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণে একদিনে ৮০টি তাজা প্রাণের অকাল মৃত্যু যাঁরা ভুলতে পারেননি, আনন্দ হাইত, নূরুল ইসলামের স্মৃতি যাঁদের বুকে আজও অম্লান তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সমন্বয়ে মর্মাহত। বামফ্রন্টের জয়ের পেছনে এঁদের সমর্থনটাও বিরাট। এই মানুষদের ধরে রাখতে, তাদের বিভ্রান্ত করতে সিপিএমকে আজ কিছুটা আন্দোলনের কথা, সংগ্রামের কথা বলতে হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই তাঁরা কিছু আন্দোলনের কর্মসূচিও যে নিয়েছেন তাও খুবই নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন, যাতে সরকারের গায়ে কোন আঁচড় না লাগে। সরকারকে আঘাত না দিয়ে বা সরকারের উপর চাপ পড়বে না এমন আন্দোলন করলে সরকার তাকে গুরুত্ব দেবেই বা কেন? এটা তো আন্দোলনের নামে মানুষকে ঠকানো।

আসলে সিপিএম সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামের কথা বলেনি। কারণ সংগ্রামটা তারা কার বিরুদ্ধে করবে? জনবিরোধী সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয় সিপিএমের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সিপিএম লড়তে পারে? এই যে বিগত আড়াই মাসের মধ্যে ইউ পি এ সরকার তিনবার পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়াল, প্রতিক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম-মন্ত্রী মণিশঙ্কর আইয়ার সিপিএমের দিল্লিস্থ দলীয় দপ্তর এ কে গোপালন ভবনে এসে আলোচনা করেই করেছেন। সিপিএমের গ্রীন সিগন্যাল না পেলে একাজ কংগ্রেস কিছুতেই করতে পারতনা। তাছাড়া সিপিএমের সমর্থনের উপরেই যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার নির্ভরশীল, সিপিএম রাজি না হলে বা প্রতিবাদ জানালে কংগ্রেসের ক্ষমতা ছিল না পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানোর। এই কারণে সিপিএম যখন সংগ্রামের কথা বলে তখন তার মধ্যে কোন জোর থাকেনা। তাহলে এই সংগ্রামের কথা বলার পেছনে সিপিএমের কী উদ্দেশ্য? প্রথমত, বামপন্থী কর্মী-সমর্থক এবং জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া, দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান জনরোষ থেকে সরকারকে বাঁচানো অর্থাৎ সেফটি ভাল্‌ব হিসাবে কাজ করা, তৃতীয়ত, কংগ্রেসের সঙ্গে দরকষাকষি করে কিছু বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেওয়া। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণও এর পেছনে আছে।

ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীও চায় সিপিএম কিছুটা 'সংগ্রাম সংগ্রাম' ভাব নিয়ে চলুক। কারণ, জনবিরোধী কার্যকলাপের পরিণামে কংগ্রেস যদি বিজেপির মতই দ্রুত জনপ্রিয়তা হারায় (যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে) এবং তাকে আর সরকারে রাখা সম্ভব না হয়, আবার এক্ষুনি বিজেপিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সিপিএমকে সামনে রেখে তৃতীয় বিকল্প দাঁড় করানোর লক্ষ্যও বুর্জোয়াদের আছে। সেক্ষেত্রে সিপিএমের এই তথাকথিত সংগ্রামী ভাবমূর্তি বুর্জোয়াদের কাছে একটা মস্ত বড় পুঁজি। সিপিএমের এই সংগ্রাম-সংগ্রাম খেলা সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবে সচেতন না থাকলে এদেশের শ্রমিক-কর্মচারী তথা আন্দোলনকারী মানুষদের বিভ্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এরা যে বাস্তবে সংগ্রামটাকেই মারবে এটা ভাল করে বোঝা প্রয়োজন। তা না হলে, ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং ডেকে দলীয় নেতারা কেন বলছেন 'জঙ্গি আন্দোলন চলবে না', 'সংঘাত নয় সহযোগিতা' অর্থাৎ মালিক-শ্রমিক বোঝাপড়া — যা বামপন্থার ঐতিহ্য বিরোধী? সিপিএম গত বছর কলকাতায় মিছিল মিটিং নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বদলীয় মিটিং ডেকেছিল। সরকারের এই নীতিকে সমালোচনা করে এই মিটিং-এ এস ইউ সি আই যোগ দেয়নি। যারা সংগ্রাম চায় তারা কোন অবস্থাতেই কি মিটিং মিছিল নিয়ন্ত্রণের দাবি করতে পারে?

তাছাড়া, সংগ্রাম নয় বরাবরই সিপিএম কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করেই চলেছে। যখন যারাই কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকুক সিপিএমের তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলতে আটকায়নি। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাদের যেমন সম্পর্ক ছিল তেমনি উপপ্রধানমন্ত্রী এল কে আদবানীর সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুসম্পর্ক রক্ষা করেই চলেছিলেন। বিজেপি যখন কেন্দ্রে ছিল তখন সিপিএম সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলেনি। বৃহত্তম বামদল হিসাবে তাদের উচিত ছিল সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলনের জন্য বিকল্প বামজোট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া। সিপিএম তা নেয়নি। শুধু তাই নয়, এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে বামপন্থী দলগুলিকে চিঠি দেওয়া হলেও সিপিএম নেতৃত্ব তাতে সাড়া দেয়নি। কেন্দ্রের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা অটুট রাখাই তাদের লক্ষ্য।

বিজেপিকে আটকানোর যে কথা বলে সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে গেল সেটাও ভেবে দেখা দরকার। বিজেপি ভয়ঙ্কর তার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে বিরাট বাধা। আর বামপন্থীরা চায় গণআন্দোলনের স্বার্থে শোষিত মানুষের ঐক্য। সেই কারণে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা। এই সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যোগায় পুঁজিপতিশ্রেণী শোষিত মানুষের ঐক্য ধ্বংস করার জন্য। অপরদিকে বামপন্থীরা শোষিত মানুষের ঐক্য রক্ষার্থে বা ঐক্য গড়ে তুলতে জনজীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলনের উপরেই গুরুত্ব দেয়। গণআন্দোলনই সমস্বার্থবোধে নানান ধর্মের-বর্ণের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। এরই সাথে সাথে বামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনার সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দেয়। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ করার পথে বহুলাংশে তার প্রভাব কমানো

আটের পাতায় দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি দাবি ভুয়া প্রমাণিত

সম্প্রতি রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর প্রকাশিত 'মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০০৪'-এ শিক্ষাক্ষেত্রের যে করুণ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা সিপিএম নেতাদের দীর্ঘদিনের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা এতদিন দাবি করে এসেছেন যে, শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার নাকি এদেশের মধ্যে প্রায় চ্যাম্পিয়ন বললেই হয়। কিন্তু তাদেরই প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, কংগ্রেস, বিজেপি ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলের সরকারগুলির মতোই এ রাজ্যের সরকারও আজ টাকার অভাবের অজুহাত তুলে শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দ কমাচ্ছে।

একদা এরাজ্যে সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ ২৩-২৪ শতাংশ করলেও বর্তমানে তা ১৩ শতাংশে নেমে এসেছে। বেতন ও প্রশাসনিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য খাতে খরচ করার মতো টাকা আর নাকি সরকারের হাতে থাকে না। এই ১৩ শতাংশ ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে পাঠ্যবই ছাপানো, বিদ্যালয়ের বাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে মাত্র ২.১ শতাংশ করে টাকা খরচ করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের দুপুরে খাবার দিতে খরচ হয় মাত্র ১.৫ শতাংশ এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজে ব্যয় হয় মাত্র ১.৬ শতাংশ অর্থ। ফ্রন্ট সরকারের ২৭ বছরের শাসনে প্রশাসনের স্তরে স্তরে চুরি-দুর্নীতি যেভাবে ছড়িয়েছে তাতে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের এই যৎসামান্য টাকারও কত অংশ কাদের পকেটস্থ হয়েছে তার হিসেব আর কোনদিন মিলবে না।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দের হিসাব- নিকাশে সরকার ও সংবাদপত্রগুলি দেখায় যে, বরাদ্দের ৯০ শতাংশ চলে যায় শিক্ষকদের বেতন দিতে, যেন শিক্ষকদের বেতন দেওয়াটা একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়! শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রয়োজন, তাঁদের বেতনও প্রয়োজন। শিক্ষার বিকাশের জন্য শিক্ষকদের বেতন ধরেই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করাই সরকারের দায়িত্ব। তা না করে তারা একদিকে এই বরাদ্দ কমিয়ে চলেছে, আবার শিক্ষকদের বেতন দিতে বেশিরভাগ অর্থ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে বলে অজুহাত দিচ্ছে।

উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজ্যের ৫৪,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ আজও গৃহহীন। ফলস্বরূপ ঝড়, বৃষ্টি, রোদে ঐসব বিদ্যালয়ে ক্লাস হওয়ার কোন সুযোগই থাকে না। যেগুলির গৃহ রয়েছে, সেগুলিতেও পানীয় জল, আলো, পাখা থেকে শুরু করে শৌচাগার, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বোর্ড, চক, ডাস্টার এবং অন্যান্য আসবাবও নেই। বহু স্কুল বাড়িতেই দিনের আলো ঠিকমতো ঢোকে না, আবার বিদ্যুৎও নেই। এসব কারণে বিদ্যালয় শিশুদের কাছে কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না বলে প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৫৩)।

জনগণনা দপ্তরের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে স্কুলবিহীন গ্রামের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। এর মধ্যে ৮৩৭৯টি গ্রামের শিশুদের ৫ কিমি পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করে স্কুলে যেতে হয়। ১০ কিমি দূরে স্কুলে যেতে হয় ১৩১৮টি গ্রামের শিশুদের। ১০ কিমি-র মধ্যেও একটি স্কুল নেই এমন গ্রামও আছে। সরকারি রিপোর্ট জানাচ্ছে তেমন গ্রামের সংখ্যা ৫২। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারকে উন্নততর বামফ্রন্ট বলে শুধু সিপিএমই নয়, বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলোও শোরগোল তুলছে এবং যে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবেদনশীল এবং 'কাজের লোক' বলে তুলে ধরা হচ্ছে, সেই মুখ্যমন্ত্রীর আমলেও অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। প্রতিবেদনে প্রকাশিত, ১৯৯৯ সালে বিধানসভায় শিক্ষা বিষয়ক কমিটি রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দুরবস্থার যে রিপোর্ট দিয়েছিল পরবর্তীকালেও সেই পরিস্থিতির কিছুই উন্নতি হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষায় যে বিদেশি ব্রিটিশ সংস্থা থেকে সিপিএম সরকার গোপন শর্তে অঢেল টাকা ঋণ নিচ্ছে, সেই ডি এফ আই ডি-র রিপোর্ট বলছে, ১০০ জন প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৭ জন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে পারে, বাকি ৮৩ জনই স্কুলছুট হয়ে যায় কোন না কোন পর্যায়ে। রাজ্য সরকার প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে এ রাজ্যে ড্রপ আউটের হার অন্যান্য অনেক রাজ্যের থেকে বেশি হওয়ার কারণ হিসাবে বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় স্কুলের অভাব, পড়াশোনার খরচ চালাবার অক্ষমতা এবং গবাদিপশুর দেখভাল, জলসংগ্রহ ইত্যাদি কাজে শিশুদের নিয়োগকে দেখানো হয়েছে (পৃঃ ১৫৪)। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ''অবৈতনিক শিক্ষা আর নয়'' বলে হুঙ্কার ছাড়ছেন, তখন সরকার প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলে অভিভাবকদের দিক থেকে পড়াশোনার খরচ সামলাতে না পারাই ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ (পৃঃ ১৫৪)। সিপিএম নেতারা এতদিন বলতেন, এই স্কুলছুট নাকি ইংরেজির ভয়ে, এবং প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার পিছনে এটিকে একটি অন্যতম যুক্তি হিসাবে তাঁরা খাড়া করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ভাষা-শিক্ষা আন্দোলন সরকারের এইসব কুযুক্তির জাল ছিন্ন করে দিয়েছে এবং সরকারকে পুনরায় প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছে। তাই আজ আর স্কুলছুট হওয়ার জন্য ইংরেজিকে দায়ী করার তাদের কোন উপায় নেই। সরকার স্কুলছুটের কারণ হিসাবে যে যুক্তিই খাড়া করুক না কেন, বাস্তবে দারিদ্রই যে এর মূল কারণ তা বুঝতে কোন বিবেচক মানুষেরই ভুল হওয়ার কথা নয়।

শুধু তাই নয়, রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় যে প্রথাগত কাঠামোটি রয়েছে সেটিকে ধ্বংস করতেও সিপিএম সরকার সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষার বদলে বিদেশি টাকায় যে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলি খোলা হচ্ছে সেখানে চারটি ক্লাসের জন্য শিক্ষক হিসাবে বরাদ্দ মাত্র একজন চল্লিশোর্ধ্ব মহিলা। শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, শিশুদের পড়ানোর উপযুক্ত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ তাদের নেই। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষকদের স্বল্প বেতন, পরিকাঠামো ও উপযুক্ত সুযোগসুবিধার অভাব প্রথাগত ব্যবস্থার তুলনায় নিকৃষ্টমানের শিক্ষা ব্যবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে (পৃ ১৫৯)। ফলে বোঝা যায়, শিক্ষার উন্নয়নের নামে এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে রাজ্যের সাধারণ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের কী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ! তবুও সর্বশিক্ষা অভিযানের নামে বিদেশি ঋণের শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে শিশু শিক্ষার এই সংহার চলছেই।

শিক্ষার এই করুণ অবস্থা নিয়ে আগেও বহুবার সরকারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজ্যে শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম দাবিই হল শিক্ষার মানের উন্নয়ন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালুর সাথে শিক্ষার মানোন্নয়নের দাবিতেও এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সহ শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ'। পর্ষদের উদ্যোগে দেড় দশক ধরে চতুর্থ শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া এবং বৃত্তি দেওয়ার কাজ চলছে। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসছে। পরীক্ষা পরিচালনায় শিক্ষকরা ও অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করছেন। বহু শিক্ষাবিদও বারবার সরকারি শিক্ষার মানের অবনমনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। কিন্তু সিপিএম নেতারা এতদিন অত্যন্ত দম্ভের সাথে তা অস্বীকার করেছেন। সাথে সাথে শিক্ষায় রাজ্যের প্রকৃত চিত্রটিও গোপন করা হয়েছে। আজ যখন কোনভাবেই শিক্ষাব্যবস্থার এই দগদগে ঘা ঢেকে রাখা যাচ্ছে না, তখন শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেছেন, 'রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, তা আমাদের জানা। এখন সকলে জানবেন, হয়তো এতে সমস্যা সমাধানের পথ পেতে সুবিধা হবে।'' সত্যিই যদি তাঁরা এই সমস্যার কথা জানতেন তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা গোপন করেছিলেন কেন? কেন যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেননি? সত্যিই কি তাঁরা শিক্ষার মানের এই অবনমনে উদ্বিগ্ন? তাঁদের আচরণে তা প্রকাশিত হয় না। আসলে শিক্ষা সম্পর্কে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী বরাবর যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও তার থেকে পৃথক কিছু নয়। তারাও মনে করে, সাধারণ মানুষের অজ্ঞানতার মধ্যেই সরকার ও শাসকদের শক্তি নিহিত রয়েছে।

মদ্যপায়ীর সংখ্যা বাড়ায় সরকার উল্লসিত

সিপিএম ফ্রন্ট সরকার আরও ১০০০টি নতুন মদের দোকান খোলবার লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। তহবিলের ঘাটতি পূরণের জন্যই নাকি রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত। রাজ্য সরকারের আক্ষেপ অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র সরকার মদ বেচে যে পরিমাণ আবগারি শুল্ক পায়, পশ্চিমবাংলা তাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। মাত্র ৫০০ কোটি টাকা এ রাজ্যে মদের শুল্ক থেকে আয় হয়। রাজ্য সরকার এ সত্য বিলক্ষণ বুঝেছে, বাজার সঙ্কট যতই তীব্র হোক, ছাঁটাই-লক আউট-লেঅফ যতই বাড়ুক, বেকারের সংখ্যা যতই গুণিতক হারে বৃদ্ধি হোক, তাতে ভোগ্যপণ্যের বাজার কমতে পারে, কিন্তু মদের বাজারে এ সঙ্কট কোন ছায়া ফেলতে পারবে না। কারণ মদের বিক্রি অর্থনীতির ব্যতিক্রমী নিয়মে হাঁটে। তাই রাজ্য সরকার বাজার সমীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছে দেশে মদ খাওয়া লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, সুতরাং সরকারের লক্ষ্মী লাভের আশা বড়ই উজ্জ্বল।

এখন পর্যন্ত এ রাজ্যে লাইসেন্সভুক্ত মদের দোকান ও বারের সংখ্যা ৪১০০টি। এর মধ্যে ১৭০০টি দেশি মদের দোকান, ৯০০টি বিদেশি মদের দোকান এবং ১৫০০টি বার। এর উপর এ বছর আরও ১০০০টি নতুন মদের দোকান চালু হবে।

গত বছর রাজ্য সরকার ৩০০০টি লাইসেন্সভুক্ত নতুন মদের দোকান চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সরকার শুধু নতুন মদের দোকান খোলার লাইসেন্সই দিচ্ছে না, যাতে মদের দোকান চালু করার ক্ষেত্রে গণবিক্ষোভ কোন বাধা না হয় তার জন্য কংগ্রেস আমলের নীতি পরিবর্তন করে নতুন নীতি চালু করেছে। আগে কোন এলাকায় মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিতে হলে স্থানীয় বিধায়ক, পুরচেয়ারম্যান বা গ্রাম প্রধানের 'নো-অবজেকশন' সার্টিফিকেট নিতে হতো। মন্দির মসজিদ উপাসনা কেন্দ্র, স্কুল-কলেজের পাশে মদের দোকান খোলা যেতনা। এখন নীতি হয়েছে স্কুল-কলেজ উপাসনা কেন্দ্রের ৩০০ ফুট দূরে মদের দোকান খোলা যাবে। সেজন্য এম এল এ, পঞ্চায়েত প্রধান বা পৌরপ্রধানের অনুমতি লাগবে না, একসাইজ কালেকটর প্রয়োজন মনে করলেই লাইসেন্স দিয়ে দেবেন। রাজ্য সরকার জনসংখ্যা অনুপাতে স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, টিউবওয়েল এসব না করতে পারুক, মদের দোকান খোলার অনুপাত কিন্তু ঠিক করে দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ১৮ হাজার জনসংখ্যা পিছু একটি এবং শহরাঞ্চলে ১২ হাজার জন পিছু একটি মদের দোকান খোলা হবে। এই হিসাবে পশ্চিমবাংলায় ৮ কোটি জনসংখ্যার জন্য ৫৩৩২০টি মদের দোকানের লাইসেন্স সরকার হয়তো কিস্তিতে কিস্তিতে অনুমোদন করবে। এখন পর্যন্ত এবারের ১০০০ লাইসেন্স ভুক্ত মদের দোকান ধরলে মোট ৫১০০টি লাইসেন্স ভুক্ত মদের দোকান চালু হবে।

এ সরকারের আর একটি মহান কৃতিত্ব এ রাজ্যে রেডি টু ড্রিঙ্ক নামক হালকা নেশার মদ চালু করা। 'টিন এজার' ছেলেমেয়েরা যারা এখনও মদ খেতে শেখেনি, কৌতুহল থেকে এই মদ খেয়ে তারা হাতেখড়ি দিতে শিখবে। ক্রমে ক্রমে এই হালকা নেশার মজা থেকে তারা আরও কড়া মদের দিকে আসক্ত হবে। 'টিন এজার'দের কাছে সহজলভ্য করার জন্য 'রেডি টু ড্রিঙ্ক' মুদি থেকে পান বিড়ির দোকান সর্বত্রই বিক্রি করা হবে। তরুণ প্রজন্মের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনাই বলতে হবে।

দিল্লির দু'টি সংস্থা স্কুল পড়ুয়া ৩০০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সমীক্ষা করে বলেছে ১৩.৬৫ শতাংশ স্কুল ছাত্র অন্তত একবার মদ ও সিগারেট খেয়েছে। অপর এক সংস্থার বক্তব্য এই সংখ্যা ৩০-৪০ শতাংশ। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলেছে মদ ও সিগারেট সহজলভ্য। (বর্তমান ৫-১২-০৩)

রাজ্য সরকারের টাকার অভাব আছে বলেই মদ বেচে টাকা তুলতে হবে, বামপন্থী নামধারী একটি সরকারের মুখে একথা বড়ই বেমানান। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা স্বাধীনতার চেতনা মেরে দিতে এদেশে মদ-জুয়ার প্রসার ঘটিয়ে ছিল, সেদিন গান্ধীজী, সি আর দাস, সুভাষচন্দ্র থেকে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীরা মাদকদ্রব্য ও জুয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। চীনে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা আফিং খাইয়ে কোটি কোটি মানুষকে বুঁদ করে রেখেছিল। মহান মাও সে তুং আফিং-এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলে চীনের মানুষকে আফিং ছাড়িয়ে সেদেশে বিপ্লব করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অথচ এ রাজ্যের বামপন্থী এমনকি কমিউনিস্ট নামধারী সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার সারা রাজ্যে মদের জোয়ার বইয়ে দিয়ে রাজ্যের মানুষকে কত বেশি মদে আসক্ত করা যায় তার জন্য হাটে-বাজারে অলিতে গলিতে মদের দোকান খুলে চলেছে — যে কাজটি পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস, জনতা, বিজেপি এতদিন করেছে। কারণ পুঁজিবাদের শোষণে জর্জরিত শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবকদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ বিক্ষোভ যাতে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে না পারে, তাই মানুষের বিবেক মনুষ্যত্ব মারার জন্য শাসক ও শোষকশ্রেণীর নানা অস্ত্রের মধ্যে মাদকদ্রব্য একটি বড় অস্ত্র।

বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির আক্রমণে বিপর্যস্ত সেচব্যবস্থা

বড় নদী-সেচ প্রকল্প পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতেই অগভীর নলকূপ সেচব্যবস্থা কৃষি উৎপাদনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অগভীর নলকূপ বসিয়ে মাটির নিচের জল তোলার পদ্ধতিটি পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালু হলেও এটির ব্যাপক প্রসার ঘটে ষাটের দশকের শেষদিক থেকে প্রধানত সরকারি উদ্যোগে। ঐ সময় থেকে প্রায় এক দশক ধরে সরকারি পরিচালনায় এবং সরকারি সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার নলকূপ বসানো হয়। তারপরও ঐ প্রক্রিয়া চলতে থাকে প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং ব্যাঙ্ক ঋণের সাহায্যে। মোট নলকূপের সংখ্যা একসময় সারা রাজ্যে দাঁড়ায় প্রায় সাত থেকে আট লক্ষে।

প্রথম দিকে সমস্ত নলকূপই প্রধানত ডিজেল পাম্পের সাহায্যে চালানো হচ্ছিল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে নলকূপগুলিতে বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু হয়। তখন বিদ্যুতায়িত প্রতিটি নলকূপেই মিটার সংযোগ ছিল এবং গ্রাহক মিটার রিডিং অনুযায়ী বিদ্যুতের বিল মেটাতেন। ১৯৮৪ সাল থেকে আরও অধিক সংখ্যক অগভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এক অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করল। তারা একদিকে যেমন মিটারবিহীন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া শুরু করল, তেমনি অন্যদিকে যে সমস্ত নলকূপে মিটার ছিল সেগুলিও রাতারাতি খুলে নিল। গ্রাহকের অনিচ্ছা বা অন্যান্য কারণে যেসব নলকূপের মিটার খোলা যায়নি, সেগুলি চালু থাকা সত্ত্বেও তারা মিটার রিডিং নেওয়া বন্ধ করে দিল।

মিটার রিডিং অনুযায়ী বিল করার পরিবর্তে তারা কৃষি-সেচ গ্রাহকদের কাছ থেকে বার্ষিক চার্জের নামে একটা থোক টাকা আদায় শুরু করল। তাদের ঐ বার্ষিক টাকার পরিমাণ উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা — কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং এর জন্য একরকম, আর পশ্চিমবঙ্গের বাদবাকি জেলাগুলির জন্য আর এক রকম স্থির করা হল। বিভিন্ন বছরে পর্ষদ ঐ বার্ষিক টাকার পরিমাণ কী হারে বাড়িয়েছে তার একটা পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

কৃষিতে বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধি

(ক) মিটারবিহীন অগভীর নলকূপ (STW) এবং সাবমারসিবল পাম্প

	উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা		পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা	
বছর	৫ ঘোড়া (STW) (টাকা)	৫ ঘোড়া সাবমারসিবল (টাকা)	৫ ঘোড়া (STW) (টাকা)	৫ ঘোড়া সাবমারসিবল (টাকা)
১৯৮৫	৯০০	—	১১০৪	—
১৯৯১	১৩৮০	—	১৭০০	—
১৯৯৬	১৬৬০	২৫০০	২০৪০	৩০৬০
১৯৯৯	৩১৫৬	৪৭৪৮	৩৯০৮	৫৭৯৬
০১-০২	৪০৬৪	৫০৮০	৫০০৮	৬২৫২
০৪-০৫	৪৪৩০	৫৫৪০	৫৪৬০	৬৮১০

(খ) মিটারযুক্ত কৃষি-সেচ (সরকারি প্রকল্প)

বছর	প্রতি ইউনিট (পয়সা)
১৯৮৫	৩৫
১৯৯১	৫৫
১৯৯৬	১০৫
১৯৯৯	১৮৩
২০০৪-০৫	১৯৩

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর চার্জ বাড়ানো হয়েছে এবং বার্ষিক চার্জবৃদ্ধির হারের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই, খেয়ালখুশি মতোই বাড়ানো হয়েছে। অগভীর নলকূপে ১৯৮৫ সালে উত্তরবঙ্গ বাদে অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গে যে বার্ষিক চার্জ ছিল ১১০৪ টাকা, ২০০৪ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ৫৪৬০ টাকায়। প্রায় ৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি। আর অন্য কোন শ্রেণীর (category) বিদ্যুৎগ্রাহকের ক্ষেত্রে এ জিনিষ ঘটেনি। ১৯৯৬ এর তুলনায় ১৯৯৯তে ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয় এবং ওই বৃদ্ধি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষিসেচ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনে। ঐ অস্বাভাবিক চার্জবৃদ্ধির কারণে হাজার হাজার কৃষকের লাইন কাটা যায় টাকা দিতে না পারার জন্য। ২০০১-০২ সালে পর্ষদের একটি সূত্র থেকে জানা যায় ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১-০২ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার নলকূপের লাইন কেটে দেওয়া হয়।

১৯৯৮ সালের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন অনুযায়ী কোন রকম বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয় এবং তারা ২০০০ সাল নাগাদ কাজ শুরু করে। ২০০০-০১ এবং ২০০১-০২ এই দুই বছরের মাশুলবৃদ্ধির আদেশ দিতে গিয়ে কমিশন সমস্ত মিটারবিহীন কৃষি-সেচ নলকূপে অবিলম্বে মিটার দেবার জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে নির্দেশ দেয়। তারপর প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। পর্ষদ একটি নলকূপেও এখন পর্যন্ত মিটার দেয়নি। সরকারি পরিচালনাধীন কিছু নলকূপে মিটার লাগিয়ে তারা কমিশনকে বোঝাতে চেয়েছে যে তারা কমিশনের আদেশ মান্য করেছে। এটা একটা মস্ত বড় চালাকি। কৃষকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে হাজার হাজার নলকূপ আছে এবং ১৯৮৫ সালের আগে যাদের মিটার ছিল, এরকম একটি নলকূপেও মিটার দেয়নি। অথচ বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রাথমিক কথাই হল সরবরাহকারী গ্রাহককে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ দিচ্ছে অথবা গ্রাহক কতটুকু বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার এবং তার ভিত্তিতে গ্রাহক টাকা দেবে। মিটার সেই মাপার কাজটি করে।

কৃষকদের মধ্যে নানান শ্রেণী আছে। তিন থেকে পাঁচ বিঘা জমি আছে এরকম ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যাই বেশি। আবার বড় কৃষক আছেন, যাঁরা সাবমারসিবল পাম্প বসিয়ে পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমি চাষ করেন, আবার জলও বিক্রি করেন। ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকেরা কখনই বড় চাষীদের মতো বিদ্যুৎ খরচ করেন না। কিন্তু উভয়ের কাছ থেকেই সমহারে বার্ষিক টাকা আদায় চলছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাধ্য করা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ টাকা দিতে। এখন ফসলের যা দাম তাতে চাষের টাকাই ওঠে না। তার উপর ঐ বড় অঙ্কের বার্ষিক টাকার চাপ। ফলে টাকা দিতে না পারার কারণে লাইন কাটা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আগেকার মত ডিজেল পাম্পসেটে ফিরে গেলেও অধিকাংশ কৃষকই বৃষ্টি- নির্ভর চাষে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আবার অনেকে ঋণের দায়ে জমিজমা বিক্রি করে বা বন্ধক রেখে কৃষিমজুরে পরিণত হচ্ছেন। অথচ এদের নলকূপে যদি মিটার থাকত তাহলে তাঁরা বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ অনুযায়ী বিলের টাকা জমা দিয়ে লাইনটিকে রক্ষা করতে পারতেন। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গায়ের জোরে তাদের সেই সুযোগ কেড়ে নিয়েছে। রাজস্ব বাড়ানোর উদগ্র বাসনা থেকে তারা বিদ্যুৎ আইনের নির্দিষ্ট ধারাকে যেমন অস্বীকার করল, তেমনি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আদেশকেও বুড়ো আঙুল দেখাল। অথচ 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩'-এর ১৪২নং ধারায় আছে, কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যদি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আদেশ না মানে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আর সব থেকে বিস্ময়কর হল এই যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কমিশনের নির্দেশ মানছে না এবং কমিশনও কোন অজ্ঞাতকারণে পর্ষদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই উভয় ধরনের অন্যায় কাজ প্রত্যক্ষ করেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নির্বিকার বসে আছে। অন্যদিকে অন্যায় এবং অযৌক্তিক বার্ষিক চার্জ দিতে না পারার কারণে বহু কৃষকের বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হচ্ছে।

পর্ষদের আরও নানান ধরনের অত্যাচার চলছে। টাকা দিতে না পারার কারণে যে গ্রাহকের লাইন কাটা গেছে তিনি হয়তো পরের মরশুমের চাষ করার জন্য ঋণ করে বা ঘটিবাটি বিক্রি করে বকেয়া টাকাটা জোগাড় করে পর্ষদ অফিসে জমা দিতে এলেন, যাতে লাইনটি জোড়া দেওয়া যায়। তাঁকে বলা হল, যে কয়মাস লাইন ছিল না, অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না সেই কয় মাসের টাকা হিসাব করে বকেয়া টাকার সঙ্গে জমা দিতে হবে। আবার ধরা যাক, একটি ট্রান্সফরমার থেকে নয়জন কী ছয়জন কৃষিগ্রাহক বিদ্যুৎ নেন। তাদের মধ্যে পাঁচজনের সমস্ত টাকা যথাসময়ে শোধ করা আছে। বাকিরা অভাবের জন্য টাকা দিতে পারেননি। এই অপরাধে পিটুনি করের মতো সকলের লাইনই কেটে দেওয়া হয়েছে। অফিসে যোগাযোগ করলে বলা হচ্ছে, বাকিদের টাকা যতক্ষণ জমা না পড়ছে কারও লাইনই দেওয়া হবে না।

মিটারযুক্ত সরকারি পরিচালনাধীন কৃষি সেচ নলকূপের বিদ্যুতের দামের চিত্র থেকেও দেখা যাবে ইউনিট পিছু দাম যেখানে ১৯৮৫ সালে ছিল ৩৫ পয়সা, সেটা ২০০৪-০৫ সালে হয়েছে ১৯৩ পয়সা। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ সেই ৫০০ শতাংশ। অথচ কৃষিতে অগ্রণী কয়েকটি রাজ্য যেমন তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধ্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম ১৯৩ পয়সা। অন্যান্য রাজ্যের অবামপন্থী সরকার কৃষকের স্বার্থে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে পারলেও এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কৃষক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে চলেছে। ফলে ফসল উৎপাদনের খরচ ঐ সব রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশি পড়ছে। তার উপর কৃষিপণ্যের দাম আমাদের রাজ্যে ক্রমশ নিম্নমুখী। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সর্বভারতীয় স্তরে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পিছিয়ে পড়ছেন, ভ্রান্ত সরকারি বিদ্যুৎনীতি তার অন্যতম প্রধান একটি কারণ। কৃষি-সেচ গ্রাহকদের সংঘবদ্ধ এবং লাগাতার আন্দোলনই পারে 'কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের' ন্যায্য দাবি আদায় করতে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা চান লাভপুরের মানুষ

বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অব্যবস্থা ও দুর্নীতি রুখতে স্থানীয় মানুষ শেষপর্যন্ত সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হলেন। ডাক্তাররা অনেকেই নন-প্র্যাকটিশিং অ্যালাউন্স নেওয়া সত্ত্বেও এমনকী হাসপাতালের সীমার মধ্যেই বেআইনি প্র্যাকটিশের সাথে যুক্ত। এমনকী বি এম ও এইচ নিজেও এর বাইরে নন। ফলে রোগীরা চিকিৎসা পাননা। সামান্য অসুস্থতার জন্যও তাঁদের বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। রোগীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলেই জোটে শাসকদলের চোখরাঙানি। কারণ অভিযুক্ত ডাক্তারদের সাথে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের রয়েছে গোপন বোঝাপড়া। এইসবের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষ হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গঠন করেন। কমিটির নেতৃত্বে গত ১৯ জুলাই বি এম ও এইচের কাছে ৭০০ মানুষের স্বাক্ষর সহ ২০ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

কিন্তু প্রতিকারের জন্য কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় গত ১৯ আগস্ট কমিটির পক্ষ থেকে ৬ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বীরভূম জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে দেখা করেন ও ডেপুটেশন দেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন মানস সিংহ, অনাদিকিংকর মণ্ডল, উত্তম রায়, মোহাম্মদ আইনাল হক, জাহাঙ্গীর আলম এবং লালন দাস।

কিশোরীর খুনীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এম এস এস

১৯ আগস্ট সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নারায়ণগড় আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানায় শতাধিক মহিলা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কিশোরী ফাল্গুনি বেরার খুনীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। নারায়ণগড় থানার পোলসিটা গ্রামের রজনীকান্ত বেরার কন্যা ফাল্গুনির সঙ্গে পাশের গ্রামের উৎপল জানার প্রেমের সম্পর্ককে ভিত্তি করে বিয়ের প্রস্তাবে উৎপলের মা ও মেশোমশাই প্রবল আপত্তি জানায়। এ নিয়ে ছেলে ও মেয়ের বাড়ির মধ্যে বিরোধ চলতে থাকে। ৪ জুন থেকে নিখোঁজ ফাল্গুনির ক্ষতবিক্ষত মৃত দেহ ১০ জুন গ্রামের একটি স্যালোটিউবওয়েলের গর্ত থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। সহজেই বোঝা যায় ফাল্গুনিকে খুন করা হয়েছে। তার বাবা মেয়ের খুনের জন্য উৎপল, তার মা এবং মেসোমশাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে থানায় ডায়েরি করা সত্ত্বেও ২ মাস হয়ে গেলেও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও খুনের তদন্ত কিছুই করেনি।

এই মহিলা বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা অনিতা মাইতি, কল্পনা মজুমদার, দীপালি সাহু, জয়শ্রী চক্রবর্তী, মিনতি ওঝা, পুষ্প দত্ত, দীপালি মাইতি। মহিলাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে ওসি বিক্ষোভকারীদের মাইকে ঘোষণা করেন — দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে তিনি কোর্টে পাঠাবেন।

ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষক মূল্যায়ন

সরকার শিক্ষকদের কার প্রতি দায়বদ্ধ করতে চায়

ছাত্রদ্বারা শিক্ষক মূল্যায়নের একটি ব্যবস্থা রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চালু করার চেষ্টা হচ্ছে। শাসক দল সিপিএম ও তার সহযোগী শিক্ষককনেতারা এর পক্ষে নানা যুক্তি দেখাচ্ছেন। তাঁদের যুক্তি হ'ল শিক্ষকরা নাকি ছাত্র ও পেশার প্রতি দায়বদ্ধ নন। কাজেই শিক্ষকদের পরিষেবার যারা উপভোক্তা সেই ছাত্রদের দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থাই একমাত্র তাঁদের দায়বদ্ধ করতে পারে, পড়াশোনার মান উন্নয়ন করতে পারে। শিক্ষাকে যারা পুরোপুরি বেচাকেনার বিষয় হিসাবে দেখে, তাদের পক্ষে এভাবে যুক্তি করায় হয়ত অস্বাভাবিকতা নেই। এই মূল্যায়ন কেমন করে হবে তার একটি নমুনাও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও একই পদ্ধতি চালু হতে চলেছে। কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, রাজ্যের কলেজগুলিতেও ছাত্র দ্বারা শিক্ষকের মূল্যায়ন তাঁরা চালু করতে চলেছেন।

কেমন মূল্যায়ন পদ্ধতি তাঁরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করেছেন? আনন্দবাজার পত্রিকায় (৩-৬-০৪) তার একটি বিবরণ পাওয়া গেছে। ''প্রত্যেক ছাত্রকে একটি ছাপা ফর্ম দেওয়া হয়। নিজেদের নাম গোপন রেখে ছাত্রছাত্রীরা ফর্মগুলি পূরণ করে জমা দেন সংশ্লিষ্ট 'ডিন'-এর কাছে। 'ডিন' সেগুলি জমা দেন উপাচার্যকে।'' উপাচার্য নাকি গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য নিজেই প্রতিটি ফর্ম খুঁটিয়ে দেখেন এবং পরে প্রত্যেক শিক্ষককে জানিয়ে দেন, ছাত্রছাত্রীর বিচারে তাঁর অবস্থান কোথায়। এছাড়া ''নিজের অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে তাঁকে সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শও'' উপাচার্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দেন। উপাচার্যের যুক্তি, ''পঠন-পাঠন যেহেতু শিক্ষকদের প্রধান কাজ, তাই তাঁদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সেই দিকটি উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।''

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের সর্বদাই ছাত্রদের সম্মুখে পরীক্ষায় দাঁড়াতে হয়। শ্রেণীকক্ষে গিয়ে কোন একটি নতুন পাঠ্য বিষয়কে ছাত্রদের বুদ্ধির গোচরে নিয়ে আসা, ছাত্রের মননজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করা এবং তার মধ্য দিয়ে ঐ বিষয়কে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যাওয়া যেকোন সুশিক্ষকের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। কেবল পাঠ্যবিষয়ই নয়, জীবনের সমস্ত প্রশ্নে দিকনির্দেশ করে তাদের উপযুক্ত ভবিষ্যৎ নাগরিক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের ভূমিকা ছাত্রছাত্রীর জীবনে অনেক। এখানেই শিক্ষকের দায়বদ্ধতা, প্রকৃত পরীক্ষা। মূল্যবোধ ও মর্যাদা সম্পন্ন একজন শিক্ষককে এই পরীক্ষায় প্রতিনিয়ত অবতীর্ণ হতে হয়। তাই ছাত্রদের কাছে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া শিক্ষকদের কাছে নতুন নয়। কিন্তু এখানে যে পরীক্ষা বা মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে একটি বিষয় প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার। ''পঠন-পাঠন শিক্ষকদের প্রধান কাজ'' বলে যে মন্তব্য উপাচার্য করেছেন তা অত্যন্ত সত্য কথা হলেও একজন উপাচার্যের নিশ্চয় অজানা থাকার কথা নয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু তা মনে করে না এবং রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সমর্থন করে। বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার গত ১৯৯৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য একটি সরকারি আদেশনামা জারি করে এবং সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার তাকে সমর্থন করে। ঐ আদেশে পদোন্নতির জন্য কোন শিক্ষককে যে যে শর্তগুলি অবশ্যই পালন করতে হবে বলে উল্লেখ আছে তাতে কোথাও শিক্ষকের পঠন-পাঠনের মানের কথা নেই। যদি তা থাকত তাহলে বহু শিক্ষক অত্যন্ত খুশি হতেন। অর্থাৎ সরকারই যেখানে পঠন-পাঠনের মান নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নয়, সেখানে পঠন-পাঠনের মানের উন্নয়ন হবে কী করে?

এখন দেখা যাক, যে মূল্যায়ন পদ্ধতি তাঁরা চালু করছেন তা শিক্ষা ও শিক্ষকের পক্ষে কতটা মঙ্গলজনক। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে যায়। (১) ছাত্ররা যে ছাপা ফর্মে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করবে তা ডিনের কাছে জমা পড়বে কেন এবং কেন উপাচার্য একা তা দেখবেন? কেন তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দেখানো হবে না? (২) কোন বিশেষ উপাচার্যের উল্লেখ না করেই বলা যায় এই রাজ্যের উপাচার্য ও ডিনরা কি নিরপেক্ষ? কে না জানে যে আজ এঁরা প্রায় সকলেই শাসক দলের প্রতি আনুগত্যের জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছেন? প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার সকল স্তরেই আজ দলীয় আনুগত্যই যেকোন নিয়োগের মূল মাপকাঠি। ফলে দিলীপ সিংহ, পবিত্র সরকারের মতো ব্যক্তিরাও উপাচার্যের আসনে বসেছেন। কাজেই সিপিএমের ছাত্রসংগঠন এসএফআই যাতে 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' ইউনিয়ন দখল করতে পারে — তা দেখা অনেক উপাচার্য অলিখিত কর্তব্য বলে মনে করছেন এবং সেইমতো কাজ করছেন। যে ''নিরপেক্ষতা বজায় রাখার'' দাবি এখানে বর্ধমানের উপাচার্য করেছেন তা যে রক্ষা হবে না তা চোখবুজে বলা যায়। ছাত্র-মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপাচার্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করবেন তার যথার্থতা সম্পর্কে শিক্ষক সুনিশ্চিত হবেন কী করে? (৩) ছাত্রদের দ্বারা পূরণ করা ঐ ফর্মগুলো দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার বদলে সেগুলি তাঁদের বিরুদ্ধেই কাজে লাগানো হতে পারে বলে শিক্ষকদের মধ্যে যে আশঙ্কা কাজ করছে তা কি অমূলক? (৪) শাসকদলের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে নিকৃষ্ট দলবাজি চলছে, যেখানে সরকারি প্রশাসন ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নগ্ন হস্তক্ষেপে ছাত্র ইউনিয়নগুলি গায়ের জোরে এসএফআই দখল করে, সেখানে ছাত্ররা কি মুক্ত মনে শিক্ষক মূল্যায়ন করবে? নাকি তারা এসএফআই-এর পৃষ্ঠপোষক ছাত্র ইউনিয়নের নেতার নির্দেশ পালন করতে বাধ্য হয়ে বিরোধী মতের শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন করবে? বর্তমান পরিস্থিতিতে, এই সব সম্ভাবনা বাতিল করা তো যায়ই না বরং বলা যায় এগুলিই ঘটবে।

ছাত্রদের দ্বারা মূল্যায়ন এই রাজ্যেও খড়্গপুর আইআইটি-তে চালু আছে। উচ্চশিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইআইটি যে বেশ উচ্চমানের, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেখানে পাঠক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, দুয়েরই ছাত্রছাত্রীরা মূল্যায়ন করে। ছাত্র-ছাত্রীদের সেখানে যে ফর্ম দেওয়া হয় তা পূরণ করে তারা জমা দেয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষককেই, প্রশাসনিক কোন কর্তার কাছে নয়। শিক্ষক সেই ফর্ম খুঁটিয়ে দেখে নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারেন ও পরবর্তীকালে তা দূর করার চেষ্টা করেন। এতে শিক্ষক লাভবান হন, ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়, আবার উপরোক্ত আশঙ্কাগুলিও শিক্ষকের থাকে না। দীর্ঘ দিন ধরে এমন মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু রেখে

আটের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই-এর ওয়েবসাইট

আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে একটি ওয়েবসাইট

www.suciweb.org

সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য দলের বিপ্লবী আদর্শ, বিশেষ করে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এযুগের অন্যতম অগ্রণী মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

এই মুহূর্তে কমরেড শিবদাস ঘোষের ৭টি প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশিত 'প্রলেটারিয়ান এরা'র সংখ্যাগুলি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। প্রতি মাসের ২ ও ১৬ তারিখে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে নতুন তথ্য যুক্ত করা হবে। ওয়েবসাইটের উন্নতিকল্পে পরামর্শ ও প্রস্তাব কাম্য।

গরু মেরে জুতো দান

সম্প্রতি দুরদর্শনের পর্দায় দেখা গেল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিম মেদিনীপুরের সহদেব ত্রিপাঠী নামে একজন দরিদ্র মেধাবী ছাত্র যে এবছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেছে, তাকে অভয় দিচ্ছেন — তার উচ্চশিক্ষার যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকার নেবে তাকে বা তার পিতা মাতাকে ভাবতে হবে না। এ পর্যন্ত এই ধরনের সাড়ে চার শতাধিক গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব নাকি রাজ্য সরকার নিয়েছে। এই তথ্যটিও ঐ সময় সাংবাদিকদের জানাতে ভোলেননি আমাদের 'সংবেদনশীল' মুখ্যমন্ত্রী। আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন (নিন্দুকেরা বলেন, নাট্যকার, নাট্যপ্রেমী বুদ্ধদেব নাকি ভালো অভিনেতাও বটে।) এরা এত গরিব যে শালপাতার থালা তৈরি করে সংসার চালাতে হয়। এদের শিক্ষার দায়িত্ব সরকার নেবে না তো, আর কে নেবে? তারপর তিনি ছাত্রটিকে বলেন ''এবার একটু হাসো'', সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্যামেরাগুলোতে তার হাসি হাসি মুখটা ধরা হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দেখেও বোঝা গেল তিনি বেশ তৃপ্ত।

এই পর্যন্ত বেশ ভালোই হচ্ছিল। কিন্তু খটকা লাগলো একটু পরেই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আরেকটি ঘটনা দেখে। দুর্গাপুরের কোক ওভেন কলোনীর দরিদ্র শ্রমিক পরিবারের ছাত্রী শম্পা দাস উচ্চমাধ্যমিকের কলা বিভাগে প্রথম বিভাগে পাশ করেও অর্থের অভাবে কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। সে এতটাই হতাশ যে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন বিকল্পই সে ভাবতে পারছে না। পরে অবশ্য ঐ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেল যে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়নি, 'আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স'-এর অনুগ্রহে সে দুর্গাপুর কলেজে অনার্স নিয়ে ভর্তি হতে পেরেছে। অপর একটি ঘটনায় দেখা গেল পুরুলিয়ার আদিবাসী ক্ষেতমজুর পরিবারের অতি দরিদ্র ছাত্র উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে 'স্টার' পেয়েও অর্থের অভাবে কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। এখন পর্যন্ত তার জন্য চেম্বার অফ কমার্স বা কোন মন্ত্রী এগিয়ে আসেননি। তাই হতাশায় ভেঙ্গে পড়া ছাত্রটি সাংবাদিককে বলেছে 'আমাদের মতো গরিবদের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার কোন মানে নেই। আমি জানি মজুরি করেই আমাকে সারাটা জীবন কাটাতে হবে'। এবং এটাই হচ্ছে এদেশের গরিব ছাত্রদের ভবিতব্য।

আট কোটি জনসংখ্যার এই রাজ্যে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, গত তিন চার বছরে তাঁরা মোট ৪৬৮ জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের উচ্চশিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছেন। এই সংখ্যাটা তুলনা করলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার কোন ভগ্নাংশ বা শতাংশের হিসেবে আসে কি? বোধ হয় না। তা না হলে এত তৃপ্ত হবার কী আছে। মুখ্যমন্ত্রী জানেন, এই দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। তিনি একথাও নিশ্চয়ই জানেন যে, এদেশে স্কুল পাশ করার আগেই শতকরা ৮৩ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

তাই প্রশ্ন জাগে কেন এমনটা হল।

বিগত ২৭ বছরে তাদের (সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্টের) রাজত্বে কংগ্রেস, বিজেপি ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলি পরিচালিত রাজ্যগুলির মতোই শিক্ষা আজ মহার্ঘ পণ্য। শিক্ষা আজ এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত। একদিকে মন্ত্রী, এম এল এ, আমলাদের বিলাস ব্যসন, বেতন ও ভাতা বাড়ছে, বামপন্থী আন্দোলনের দাবিকে নস্যাৎ করে সরকারি ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী পুলিশ খাতে বিপুল হারে ব্যয় বাড়ছে। অন্যদিকে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জনকল্যাণ খাতে ব্যয় কমছে। প্রতি বছর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি অনুদান কমিয়ে দিচ্ছে। রাজ্য সরকার বেশ কয়েক বছর যাবৎ স্কুলগুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের বেতন ছাড়া আর সমস্ত অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বাড়ছে ডোনেশন ও ফি বৃদ্ধির দৌরাত্ম্য। স্কুল কলেজে বিপুল হারে ফি বেড়েছে। বিগত ৪/৫ বছরে পেশাগত শিক্ষা (ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল প্রভৃতি) ও উচ্চশিক্ষায় ফি বৃদ্ধি ঘটেছে ৫০ থেকে ১০০/১৫০ গুণেরও বেশি। অথচ পরিসংখ্যান বলছে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের আয় বাস্তবে কমছে। ফলে শিক্ষা আজ সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। পেশাগত ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিসংখ্যান নিলেই বোঝা যাবে কীভাবে সাধারণ গরিব ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছে, বাড়ছে উচ্চবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। পয়সার অভাবে ভর্তি হতে না পেরে অধিকাংশ গরিব ছাত্রছাত্রী পুরুলিয়ার ওই মেধাবী দরিদ্র ছাত্রটির মতো হতাশার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। তাই মাননীয় বুদ্ধদেববাবুর কাছে বিনীত প্রশ্ন, আপনাদের জনবিরোধী নীতির ফলেই আজ অধিকাংশ গরিব ছাত্র শিক্ষার আঙ্গিনা ছেড়ে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে বাধ্য হচ্ছে। আর আপনি মুষ্টিমেয় দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে (এটা তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ নয়, জনগণের রক্ত জল করা ট্যাক্সের অর্থ) প্রচার মাধ্যমের বাহবা কুড়োচ্ছেন। যেকোন সভ্য গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব নেবার কথা। এর জন্য তো কোন ছাত্রকেই মন্ত্রীর দরবারে যাবার প্রয়োজন পড়ার কথা নয়। তাহলে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য দায়ী কে? বিগত ভাষা শিক্ষা আন্দোলনের সময় ভাষাচার্য্য সুকুমার সেন বলেছিলেন, যেকোন সভ্য গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হোল জনগণকে শিক্ষা দান করা। (এর জন্য তাঁরা জনগণের কাছে প্রতিনিয়ত ট্যাক্সও নিয়ে থাকেন) যেমন যে কোন মায়ের কর্তব্য তাঁর শিশুকে মাতৃদগ্ধ পান করানো, এর জন্য কি কোন মা কৃতিত্ব বা বাহবা দাবি করতে পারেন?

লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের শিক্ষার সর্বনাশ ঘটিয়ে অতি নগন্য সংখ্যক কয়েকজন ছাত্রকে ঢাকঢোল পিটিয়ে সাহায্য করার মধ্যে গরু মেরে জুতো দানের স্থূল ভণ্ডামিটাই নগ্ন হয়ে যাচ্ছে না কি বুদ্ধদেববাবু?

বিহার ও আসামে বন্যাত্রাণে এসইউসিআই ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

বিহার ও আসাম এই দুই রাজ্যেরই বহু জেলা এবার বন্যায় ভেঙে গেছে। বহু মানুষ মারা গেছে, প্রচুর ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। যাঁরা বেঁচে আছে, তারাও অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সরকারি তরফ থেকে কি কেন্দ্র, কি রাজ্য, বন্যার্তদের বাঁচাবার কোন চেষ্টাই হয়নি, উপযুক্ত ত্রাণেরও ব্যবস্থা হয়নি। আমাদের দলের কর্মীরা সর্বত্র বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা ও ত্রাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিহারের পাটনা, জাহানাবাদ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, মুজঃফরপুর, বৈশালী সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্যাত্রাণে খাদ্য, কাপড়, ওষুধ, টাকা সংগ্রহ করে বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। মজঃফরপুর শহরের বাড়ি বাড়ি থেকে রুটি তৈরি করে ত্রাণ শিবিরগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গে সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী দুই রাজ্যের বন্যাপীড়িতদের মাঝে বিতরণের কাজ চলছে। একাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সমাজসেবী সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। ফলে বন্যাপ্লাবিত এলাকাগুলিতে ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি রোগের চিকিৎসার কাজ করাও সম্ভব হচ্ছে।

মজঃফরপুরের কাঁটি ব্লকে তুরকি গ্রামে ত্রাণশিবির

ধুবড়ি জেলায় ক্যাম্প। ওষুধ ও ত্রাণ বিতরণ করছেন কমরেড জয়নাল আবেদিন

সম্প্রতি বিহার ও আসামের বেশ কিছু জেলায় এস ইউ সি আই কর্মীদের সাথে ঐ দু'টি রাজ্যের এবং পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশ থেকে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যৌথভাবে ত্রাণ ও চিকিৎসার কাজ করে এসেছেন। গত ১৪ আগস্ট ও ১৯ আগস্ট মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে দুটি দল যথাক্রমে বিহার ও আসামে যায়। ১৩ আগস্ট পাটনা শহর থেকে মেডিকেল টিমের যাত্রা উদ্বোধন করেন পাটনা শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পি গুপ্ত। বিহারে তিনদিন ধরে মুজঃফরপুর জেলার মুরাওল, কাঁটি ও মীনাপুর ব্লকের অন্তর্গত গ্রামগুলিতে ত্রাণ ও চিকিৎসা শিবির পরিচালিত হয়। এই তিনটি ব্লকেই বন্যার্ত মানুষের অবস্থা শোচনীয়। জল নেমে যাওয়ার পর কলেরা ও অন্যান্য জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। কাঁটি ব্লকের তুরকি গ্রামে কলেরায় আক্রান্ত ২৫ জনের মধ্যে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং তাদের দেহও জলে ভেসে গেছে। দলের পক্ষ থেকে এই তিনটি ব্লকের ত্রাণকার্য কমরেডস্ চন্দ্রকান্ত মিশ্র, রামযশ মিশ্র ও লালবাবুর নেতৃত্বে কর্মীরা পরিচালনা করেন। উল্লেখ্য যে কলকাতা থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অপর একটি দল দ্বারভাঙ্গা ও বেগুসরাই জেলার উদ্দেশ্যে ২৮ আগস্ট রওনা হয়েছে, যেখানে মেডিকেল ক্যাম্প ৩০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

আসামে একযোগে ত্রাণ ও চিকিৎসা শিবির চলেছে ১০ থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। মূলত গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি জেলার বন্যাপ্লাবিত গ্রামগুলিতেই ত্রাণকার্য চালানো হয়েছে। ২২টি ক্যাম্পে ৯ দিনে প্রায় ১৪ হাজার রোগীকে পরীক্ষা করে যেসব ওষুধ দেওয়া হয়েছে, টাকার মূল্যে তার পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা। গোয়ালপাড়া জেলার মারকুলা, বাঁশবেড়িয়া, চুনারি, তেরঙ্গপুর এবং ধুবড়ি জেলার ফকিরগঞ্জ, ময়নাকান্দি, হাজিরহাট, কাটিয়ালমারিচর, চারমণির চর, কাকরিপাড়া সহ বহু গ্রাম ও হাটবাজারে ক্যাম্প করে ওষুধ ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ধুবড়ি জেলায় দলের পক্ষ থেকে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস্ জয়নাল আবেদিন, আজহার হুসেন ও সুরজাতামন মণ্ডল। গোয়ালপাড়া জেলার ত্রাণকার্য পরিচালনায় ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নাজমুল হক এবং কমরেডস আবদুল হামিদ ও আবদুল কাদের।

বিহারে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ২টি টীমে সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক ডাঃ বি এন পড়িয়া ও ডাঃ অংশুমান মিত্র'র নেতৃত্বে কাজ করেছেন বিহার থেকে ৪ জন ডাক্তার, নালন্দা মেডিকেল কলেজের ৬ জন ছাত্র, জবলপুরের ২ জন স্বাস্থ্যকর্মী এবং পশ্চিমবঙ্গের ৬ জন ডাক্তার, ৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী, ২ জন মেডিকেল ছাত্র ও ১ জন ফার্মাসিস্ট। বিহারের দুইজন প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ পি গুপ্ত ও ডাঃ পি সি সিং রোগে আক্রান্ত বন্যাপীড়িতদের চিকিৎসায় আন্তরিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন।

আসামে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সদস্য ডাঃ ভবানী শঙ্কর দাস, ডাঃ টি মণ্ডল, ডাঃ ভবরঞ্জন শিকদার, ডাঃ নীলরতন নাইয়ার নেতৃত্বে ৩টি টীমে আসাম থেকে ১ জন ডাক্তার ও ১৩ জন স্বাস্থ্যকর্মী এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৩ জন ডাক্তার ও ৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করেছেন। উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অপর একটি দল আসামের উদ্দেশ্যে ২৯ আগস্ট রওনা হয়েছে।

মজঃফরপুরে পার্টির বিশিষ্ট সংগঠকের জীবনাবসান

গত ৯ আগস্ট এস ইউ সি আই বিহার রাজ্যের মজঃফরপুর জেলা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড রামবাহাদুর রায় বন্যাপীড়িতদের রিলিফের কাজ করে বাড়ি ফেরার সময় এক দুর্ঘটনায় নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। ছাত্রাবস্থায় তিনি দলের ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে মজঃফরপুর জেলার মীনাপুর ব্লকে গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে তিনি পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বহু শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সমস্ত সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে প্রথমে তিনি মীনাপুর ব্লকে পার্টি ইনচার্জ এবং পরে পার্টির মজঃফরপুর জেলা কমিটির সদস্য হন। ২০০১ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি রাণীখেরা অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হন এবং নানা জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

তাঁর পঞ্চায়েত এলাকাও এবার বিধ্বংসী বন্যার কবলে পড়ে। বন্যার সময় প্রবল স্রোতের মধ্যেও নিজের জীবন বিপন্ন করে বন্যাদুর্গত মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি তাঁদের খোঁজখবর নেন এবং তাদের বাঁচানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। বন্যার জল নেমে গেলে বন্যাপীড়িতদের ত্রাণে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বন্যাদুর্গতদের মধ্যে পরের দিন বিতরণের জন্য সংগৃহীত জামাকাপড়, খাদ্য ইত্যাদি এক জায়গায় সুরক্ষিত রেখে, ৯ আগস্ট তিনি যখন সাইকেল চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন তখন একটি ট্রাক্টর তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে গুরুতর জখম করে এবং পরে তিনি মারা যান।

১০ আগস্ট তাঁর মরদেহ মজঃফরপুরে দলের কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর, জেলা সম্পাদক কমরেড রামসুরত ঠাকুর, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ লখীচন্দ্র রায়, যোগেন্দ্র রাম, মহম্মদ ইদ্রিশ, রামপ্রীত রায়, লালবাবু মাহাতো মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। মরদেহ সেখান থেকে প্রথমে তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এবং পরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রিয় নেতার মৃত্যুতে পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত গ্রামের মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং প্রিয় নেতাকে শেষবারের মত দেখতে জড় হন। পরে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়।

১৮ আগস্ট মীনাপুর ব্লকের তুর্কী হাইস্কুল প্রাঙ্গণে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশংকর বলেন, বিপ্লবের প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালন করতে পারলেই কমরেড রামবাহাদুর রামের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে। রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড অরুণকুমার সিং বলেন, যথার্থ বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করার দ্বারাই আমরা তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ রামসুরত ঠাকুর, কাশীনাথ সাহানী, মোঃ ইদ্রিস, শ্যামচন্দ্র যাদব, দীনেশ রায়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড রূপচন্দ্র সাহ্।

কমরেড রামবাহাদুর রায় লাল সেলাম

বন্যা রিলিফে টাকা নেই, অপচয়ে বন্যা

ভারতীয় গণতন্ত্রের 'দেবভূমি' পার্লামেন্ট চালাতে খরচ ঘণ্টায় কমপক্ষে ২০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, দিনে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা (সূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৮-৮-০৪), মতান্তরে এই খরচ দিনে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা (সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস ২১-১১-০১)

রাজ্যে বিধানসভা চালাতে খরচ দু'বছর আগেই ছিল ২০ কোটি ৪১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা (সূত্র ঃ আনন্দবাজার, ১০-৭-০২)। রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার প্রধানত মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য একটা হেলিকপটার বসিয়ে রেখে বছরে কয়েক কোটি টাকা গুণছে। পাইলটকে বসিয়ে মাসে ১৫০০০ টাকা মাইনে দেওয়া হচ্ছে। (সূত্র ঃ স্টেটস্ম্যান ২৪-৮-০৪)

সংবাদে প্রকাশ, এবারের সংসদের বাজেট অধিবেশনে বিরোধীপক্ষ বিজেপি'র বয়কটের ফলে ৮৭ ঘণ্টা সংসদে কাজ হয়নি। ফলে ১৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নষ্ট হয়েছে।

শুধু এই ১৭ কোটি টাকাতেই ১০০০ বন্যাদুর্গত গ্রামের সব মানুষকে খাদ্য, আশ্রয়, ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্র দেওয়া যেত। অথচ বন্যার্ত মানুষ মরছে খাদ্যাভাবে, মহামারীতে। রিলিফের জন্য টাকা নেই, যা আছে তা চুরির জন্য — কিবা অন্য রাজ্যে কিবা পশ্চিমবঙ্গে!

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষক মূল্যায়ন

ছয়ের পাতার পর

খড়্গপুর আইআইটি কি রাজ্যের কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে? এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই রাজ্যে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) এবং বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু আছে।

তাহলে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চালু করলেন কেন? অন্যত্রও একইভাবে শিক্ষা প্রশাসনের কর্তৃত্বে মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা হচ্ছে। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, এইরূপ মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করার পিছনে সরকার ও শাসকদলের সক্রিয় মদত এবং গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সিপিএম এ রাজ্যে যা করছে তা থেকেই তাদের মতলব বেরিয়ে আসে। সিপিএম ক্ষমতায় আসার পর ধীরে ধীরে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার যাবতীয় নীতি নির্ধারক ও প্রশাসনিক কমিটিগুলিকে কখনও বেআইনিভাবে, কখনও আইনের ঠাটবাট বজায় রেখে গায়ের জোরে দলীয় লোক দ্বারা ভর্তি করে। ফলত, শিক্ষার সমস্ত স্তরে চলতে থাকে চূড়ান্ত দলবাজি। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক, আধিকারিক থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা দলীয় আনুগত্যই প্রধান মাপকাঠিতে পর্যবসিত করেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতাকে গৌণ করে দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে একটা কথা চালুই হয়ে গিয়েছে, তাহল 'পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট' বা রাজনৈতিক নিয়োগ। অর্থাৎ, শিক্ষাগত মান নয়, ব্যক্তিটি শাসকদলের কর্মী-সমর্থক কিনা সেটাই নিয়োগের ক্ষেত্রে মূল বিচার্য বিষয়। এর ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলি শাসকদলের ধামাধরা ব্যক্তির আধিপত্যে ছেয়ে গিয়েছে। শাসকদল বলে, শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের সমর্থক, সিপিএমের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত। প্রশ্ন হল, তাহলে শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক মূল্যবোধহীনতা বা দায়বদ্ধতার অভাবের যে নজির তাঁরা দেখাচ্ছেন, সেজন্য দায়ী কারা? শাসক সিপিএম সে দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে কি? সরকারের অন্যায়, শিক্ষা ও ছাত্রস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপকে সমর্থন করতে শিক্ষকদের বাধ্য করে শিক্ষকদের নৈতিক মেরুদণ্ড তারাই ভেঙে দিয়েছে। তাই সামাজিক অন্যায়-ভ্রষ্টাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে যে শিক্ষক-অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের ঐতিহ্য এরাজ্যে ছিল, আজ সেই প্রতিবাদের কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও নানা বিষয়ে যতটুকু প্রতিবাদ হচ্ছে তাও সিপিএম বা ফ্রন্ট সরকারকে যথেষ্ট বিব্রত করছে। সেই প্রতিবাদের কণ্ঠকে সিপিএম আজ স্তব্ধ করতে চায়। তাই তাদের উদ্দেশ্য হল ক্যাম্পাসে ভীতির পরিবেশ তৈরি কর, দলীয় ছাত্র ইউনিয়নকে দিয়ে শিক্ষকদের ভয় দেখাও, পেশাগত ও অন্য নানা বিষয়ে শিক্ষকদের চাপে রাখ যাতে তাঁরা সরকারি ও দলীয় ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে মুখর না হন। সেইজন্যই ছাত্রদের দ্বারা এই তথাকথিত মূল্যায়ন ব্যবস্থা। এই মূল্যায়ন তাই কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

কংগ্রেস-সিপিএম সমন্বয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই

তিনের পাতার পর

সম্ভব হয়। কিন্তু সিপিএমের কাছে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার অর্থ হল, বিজেপিকে ভোটে হারানো এবং ক্ষমতা দখল করা। বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত অবশ্যই করতে হবে এবং তা করতে হবে গণআন্দোলনের আঘাতে। সিপিএম এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে বিজেপিকে ভোটে হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার দ্বারা কি বলা যায় সাম্প্রদায়িকতা পরাস্ত হয়েছে? সিপিএম নেতারাও বলছেন সাম্প্রদায়িকতার বিপদ রয়েছে। বরং বিজেপি পানাজিতে চিন্তন বৈঠকে আবার খোলাখুলি হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকেছে।

'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে হবে' এই যুক্তিও ভয়ঙ্কর। এজন্য সিপিএম কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে সার্টিফিকেট দিয়েছে। যে কংগ্রেস স্বাধীনতার পর থেকে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী, যে কংগ্রেস বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে রামলালা পুজোর সূচনা করেছিল এবং যে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতার মানে দাঁড় করিয়েছে সর্বধর্মে সমান উৎসাহ দান, তাকে সিপিএম ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে তুলে ধরেছে। এটা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা হল সমস্ত রকম অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতি। ধর্ম হবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। রাষ্ট্র ধর্মীয় ব্যাপারে উৎসাহও দেবে না, বাধাও দেবে না। রাষ্ট্রীয় তথা সরকারি কাজে কোন ধর্মীয় আচার আচরণ পালিত হবে না। কংগ্রেস এই নীতির দ্বারা কোনকালেই পরিচালিত হয়নি। এহেন কংগ্রেসকে সিপিএম ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে তুলে ধরে কেবল ক্ষমতার বৃত্তে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের সান্নিধ্য পেতে। তাদের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার স্লোগানটাও তাই অনেকটা ফাঁকা। মূল লক্ষ্য তাদের ক্ষমতায় যাওয়া। আর এজন্য প্রাদেশিকতাবাদী শক্তি এজিপি, উগ্রজাতিবাদী দল আর জে ডি প্রভৃতি দলের সঙ্গে অনায়াসে তারা যেতে পারে। তারা সব দলের সঙ্গে যেতে পারে, তাদের যত অনীহা সর্বভারতীয় স্তরে বিকল্প বামপন্থী আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি করায়।

কেন তাদের এই মনোবৃত্তি? কারণ তারা আজ বামপন্থী মার্ক্সবাদী নামের আড়ালে বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর কেন্দ্রীয় সরকারে যাওয়া নিয়ে কেন তাদের এত স্ববিরোধী বক্তব্য? কারণ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘর করবো, আর বামপন্থীদের মত বুলি ছড়াবো — এই যদি নীতি হয় তাহলে স্ববিরোধিতা তো ফুটে উঠবেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সমন্বয়ের উদ্দেশ্য আসলে পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই রক্ষা করা। আর সংগ্রামের উদ্দেশ্য, একদিকে বামপন্থার নামে জনসাধারণ তথা কর্মী-সমর্থকদের ঠকানো, অর্থাৎ সমন্বয়ের নামে আত্মসমর্পণের দিকটি যাতে জনসাধারণ ও দলের কর্মী-সমর্থকরা ধরতে না পারে এবং প্রশ্ন তুলে বিব্রত না করতে পারে, অন্যদিকে, সরকারি সুযোগসুবিধার যত বেশি সম্ভব ভাগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানো। বামপন্থী মানুষদের সিপিএমের এই অশুভ রাজনীতির মুখোশ খুলে দিতে হবে, না হলে বর্তমান অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে না।

গণআদালতের বিচারে বুশ যুদ্ধাপরাধী

২৬ আগস্ট নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত গণআদালতের প্রতি সংহতি জানিয়ে ভুবনেশ্বরে বিক্ষোভ

২৭ আগস্ট কলকাতায় মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ।(ইনসেটে) কুশপুতুলে আগুন দিচ্ছেন অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল।

সকল বেকারের কাজের দাবিতে ও
মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে
এ আই ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে

৪র্থ রাজ্য যুব সম্মেলন

শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য নগর (জয়নগর), দক্ষিণ ২৪ পরগণা
প্রকাশ্য সমাবেশ
৩ সেপ্টেম্বর, বেলা ২টা, রক্তাখাঁ মাঠ

প্রধান অতিথি ঃ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড সৌমেন বসু. রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, এস ইউ সি আই
বক্তা ঃ কমরেড মবিনুল হায়দার চৌধুরী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
ডাঃ কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ, কমরেড ভগবান রেড্ডি, কমরেড ভেনুগোপাল (কর্ণাটক) কমরেড ধূর্জটি দাস (ওড়িশা); কমরেড সুধীর কুমার, কমরেড পার্থসারথি ভার্মা (কেরালা) এবং অন্যান্য রাজ্যের এ আই ডি ওয়াই ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।
কমরেড রূপম চৌধুরী, রাজ্য সম্পাদক, এ আই ডি ওয়াই ও
অধ্যাপক কমরেড তরুণ নস্কর
কমরেড সুব্রত গৌড়ী, রাজ্য সভাপতি, এ আই ডি এস ও
সভাপতি ঃ কমরেড খাদিজা বানু, রাজ্য সভানেত্রী, এ আই ডি ওয়াই ও

প্রতিনিধি সম্মেলন
বহড়ু হাইস্কুল মাঠ ৪-৫ সেপ্টেম্বর
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক, এস ইউ সি আই

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net